সৌরবিপ্লব: জ্বালানি স্বনির্ভরতায় বাংলাদেশের কৌশলগত অগ্রযাত্রা

আধুনিক বিশ্বে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মৌলিক চাহিদার মতোই অপরিহার্য। বাংলাদেশের মতো প্রায় ২০ কোটি জনসংখ্যার দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুতের প্রয়োজন যেন জীবনের মতই। খাদ্য উৎপাদন, পরিবহন, যোগাযোগ, শিল্প-কারখানা এবং পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। তাই জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেলে এর সরাসরি প্রভাব পড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর। আমাদের দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেহেতু এগুলো নবায়নযোগ্য না তাই পুনরায় ব্যবহার করাও সম্ভব না। যে দেশগুলো শুধুমাত্র জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর তাদের ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু সমস্যা। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় আমদানিনির্ভর দেশগুলো পড়ে ফাঁদে। যখন বিশ্বব্যাপী সংকট তৈরি হয় তখন এর থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার পথ হচ্ছে বিকল্প জ্বালানি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সূর্য, পানি ও বাতাস প্রাকৃতিকভাবে আসে এবং ব্যবহারও করা যায় একাধিকবার। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। কারণ, এই উৎসগুলো শুধুমাত্র যে সাশ্রয়ী তাই নয় বরং এগুলো পরিবেশবান্ধবও।

বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদক দেশ হচ্ছে চীন। প্রতিবছর চীন সৌর ও বায়ু শক্তি থেকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। পরিসংখ্যান বলছে চীনে পানি, বাতাস, সৌর থেকে ৩৫ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থাপিত চীনের এ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পূরণ করছে কোটি কোটি মানুষের বিদ্যুৎ চাহিদা।

বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারেও চীন বিশ্বের শীর্ষ দেশ। যা তাদেরকে তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়েছে। এবং এর নেপথ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অবদান।

নেপালের মতো দেশ যারা ৯০ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ পানি থেকে উৎপাদন করছে। নেপালে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কাঠমাণ্ডু শহরের অনেক বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় সৌর বিদ্যুৎ। যদিও সৌর প্যানেল স্থাপনের খরচ শুরুর দিকে বেশি কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এর খরচ অনেক কম।

ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের মোট বিদ্যুতের একটি বৃহৎ অংশ আসে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় স্থাপিত বায়ুবিদ্যুতের কল সমূহ থেকে। এই দেশটির জ্বালানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে

বায়ুবিদ্যুৎ। ডেনমার্ক এই প্রক্রিয়ায় নবায়ন অযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশেই হ্রাস করতে পেরেছে। দেশটি বিদ্যুৎচালিত ট্রেন ও পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত করতে পেরেছে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বে অন্যতম অগ্রগামী দেশের তালিকায় রয়েছে নরওয়ে। দেশটির অধিকাংশ বিদ্যুতের উৎস হলো সে দেশের নদী ও জলপ্রবাহ। নরওয়ের প্রায় শতভাগ বিদ্যুৎ আসে জলবিদ্যুৎ থেকে। সেদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার অনেক জনপ্রিয়, যা একেবারেই পরিবেশবান্ধব।

সুইজারল্যান্ড সোলার ইমপালস-২ নামে একটি সৌরচালিত বিমান টানা ১০০ ঘণ্টারও বেশি সময় আকাশে ওড়াতে সক্ষম হয়েছে।

এই উদাহরণগুলোর আলোকে সহজেই অনুমেয় যে, প্রাকৃতিক উৎস হতে জ্বালানি উৎপাদন শুধু সম্ভবই নয়, বরং তা অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে লাভজনকও বটে।

বৈদেশিক নির্ভরতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার হতে পারে একটি অন্যতম বিকল্প। বাংলাদেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে সূর্য, পানি ও বাতাস থেকে উৎপাদন একেবারেই অপ্রতুল। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র ১-২ শতাংশ উৎপাদিত হয়।

২০০৭ সালে স্থাপিত কুতুবদিয়ার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা ছিল ১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন। এটি বর্তমানে যথাযথ

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও কারিগরি ত্রুটিজনিত সুদীর্ঘসময় ধরে অচল। প্রায় ৪ দশক আগে সৌরবিদ্যুৎ ও পরবর্তী সময়ে জৈবগ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, এখন অবধি এটি আলোর মুখ দেখেনি।

বর্তমানে বাংলাদেশ বছরে আনুমানিক ৭ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি আমদানিতে।

তন্মধ্যে তরল জ্বালানিতে ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার এবং ৩.৮ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় এলএনজি আমদানিতে। তরল জ্বালানি যেমন ফার্নেস ওয়েল ও ডিজেল যার বড় অংশই ব্যবহৃত হয় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে। এটি যে শুধু অবকাঠামোগত বিনিয়োগ তা নয় এটি স্থায়ী পুনরাবৃত্ত ব্যয়, যা দেশের প্রবাসী আয়ে গড়ে ওঠা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে তৈরি করছে ক্রমাগত চাপ।

আমদানি-নির্ভরতা চাইলেই কমানো সম্ভব নয়। কারণ, এ খাত থেকে উপকৃত স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে প্রবল প্রতিরোধ। এমন প্রতিকূল পরিবেশে অদক্ষতা, পুঁজি পাচার এবং অস্বচ্ছ আর্থিক প্রবাহের সুযোগ বাড়ে।

গত প্রায় এক দশকে বাংলাদেশের জ্বালানি কাঠামো হয়ে উঠেছে ক্রমশ আমদানি-নির্ভর। বিশ্ববাজারে ক্রমাগত দামের ওঠানামা, ভর্তুকির চাপ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টানাপোড়েন সব মিলিয়ে অর্থনীতি চলে যাচ্ছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার দিকে। জ্বালানি ব্যয় কোনো স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে না। কিন্তু, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সেখানে তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ। তাই জ্বালানি ব্যয়ের বিপরীতে সৌরশক্তি এক ভিন্ন পথের দিশা দেয়।

যেখানে প্রাথমিক বিনিয়োগ থাকলেও পরবর্তীতে উৎপাদন খরচ প্রায় শূন্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব।

বর্তমান সময়ে সৌরশক্তি বিশ্বের অন্যতম সস্তা বিদ্যুৎ উৎসে পরিণত হয়েছে। বলা যায় বাংলাদেশ এক বিরল সুযোগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে স্বল্প খরচে প্রযুক্তি আমদানি করে দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সক্ষমতা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু, নীতিমালা এই অনুকূল সময়েই গ্রহণ প্রক্রিয়াকে মন্থর করে দিচ্ছে।

এক্ষেত্রে পাকিস্তান ইতিমধ্যেই অন্যদের পথ দেখাচ্ছে, কীভাবে বিকেন্দ্রীভূত সৌরশক্তি একটি জ্বালানি ব্যবস্থাকে

বদলে দিতে পারে। সেখানে ছাদভিত্তিক সৌরস্থাপনার বিস্তার এতটাই যে, কিছু অঞ্চলে সমগ্রদিনের বিদ্যুৎ চাহিদার ২০ থেকে ২৫ শতাংশই পূরণ হচ্ছে সৌরশক্তি থেকে। তাদের এই সাফল্যের নেপথ্যে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ প্রকল্প নয়, কাজ করছে ব্যক্তি, শিল্প ও কৃষি ব্যবহারকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিনিয়োগ। বাংলাদেশ একই হারে সৌরশক্তি উৎপাদন করতে পারলে বছরে ৩ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করা সম্ভব।

দেশে পানি, সৌর ও বাতাস মিলিয়ে মোট বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র ৬ শতাংশেরও কম। ৯০ শতাংশের বেশিই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গ্যাস, তেল ও কয়লা নির্ভর।

প্রতিটি জ্বালানি আমদানি রিজার্ভে চাপ বাড়ায়, আর প্রতিটি সোলার স্থাপনা ভবিষ্যতের আমদানি নির্ভরতা কমায়। একটি জাতীয় সৌর-উদ্যোগ বছরে বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারে। বৈশ্বিক দামের অস্থিরতা কমিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে এটি অনন্য।

বাংলাদেশ এখন এক স্পষ্ট কৌশলগত মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিবছর বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আমদানি-নির্ভরতার চক্রে আবদ্ধ থাকবে নাকি এর থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজবে এটিই প্রশ্ন এখন। বর্তমান বিশ্ববাজারে সোলার দামের পতন, বেসরকারি বিনিয়োগ, নেট মিটারিং, ফিড-ইন ট্যারিফ এবং কমিউনিটি গ্রিডের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত করার উপায়সমূহের ব্যপারে উদ্যোগী হতে পারলেই নিশ্চিত হবে জ্বালানি ভবিষ্যৎ।

সৌরশক্তিকে অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এটিকে করমুক্ত পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি এর বাস্তবায়ন করতে হবে। নীতিমালা যেন হয় উৎসাহদায়ক। সঠিক প্রণোদনা, বিশেষ করে কার্যকর ফিড-ইন ট্যারিফ এবং আরইবির (REB) মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কমিউনিটি সোলার বাস্তবায়ন করতে হবে। এসবকিছু সঠিকভাবে করা গেলে বাংলাদেশ এমন রূপান্তরের পথে হাঁটবে যা হবে অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত, আর্থিকভাবে দায়িত্বশীল এবং কৌশলগতভাবে অপরিহার্য।

বাংলাদেশের উচিত জীবাশ্ম জ্বালানির নতুন উৎস অনুসন্ধান এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদনের দিকে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। এতে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং পরিবেশও থাকবে সুরক্ষিত।